[নভেলা]

রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর অসমাপ্ত পালা

প্রশান্ত মৃধা

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99579-4-2

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর অসমাপ্ত পালা
প্রশান্ত মৃধা

বেঙ্গলবুকস প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ উপলক্ষে মুদ্রিত
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

Rupkumar o Horobolasundorir Osomapta Pala
by Prasanta Mridha

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

প্রথম দৃশ্য

ইসলাম উদ্দিন পালাকারের রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর পালা আরও আগে শুরু হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। ইসলাম উদ্দিন পালাকার পালা শেষ না করেই আসর ভাঙেন, এর আগে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জানান, ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন সুযোগ পান, তাহলে এই পালার বাকি অংশটুকু আমাদের শুনিয়ে যাবেন। কিন্তু পালা শুনতে উপস্থিত এই মুহূর্তে শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রায় প্রত্যেকেরই জানা আছে, যদি জানা না থাকে তবে তা অতি সামান্যরই—যারা অর্বাচীন তরুণ আর দুই-একটি শিশু—একমাত্র তারাই জানে না যে, এখানে এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত পরে যেদিন ইসলাম উদ্দিন পালা শোনাবেন সেদিন অনেকেই উপস্থিত থাকবেন না। কেউ হয়তো আর কোনোদিন কোনো পালার আসরে উপস্থিত হবেন না। কেউ সেই মাহেন্দ্রক্ষণের আগে ভবলীলা সাঙ্গ করবেন। কেউ হয়তো সেদিন আজ পালাটা যে জায়গায় শেষ হলো, পালাকার সেখানে উপস্থিত হওয়ার আগেই অনিবার্য কোনো তাড়নায় পালা ছেড়ে চলে যাবেন। কেউ হয়তো এও জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উন্মুক্ত চত্বরে ইসলাম উদ্দিন আবার যেদিন পালা শোনাতে আসবেন, সেদিন উদ্যোক্তারাই তাকে আর এই পালাটি গাইতে দেবেন না। ফলে ইসলাম উদ্দিন পালাকার যতই বলুন, যতই রাত্রি দ্বিপ্রহরে পৌঁছানোয় ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক আকুল প্রার্থনা জানিয়ে পালা শেষ করার জন্য তৎপর হন—আসলে এই পালা আর কোনোদিনও শোনা হবে না তাদের।

এই বাস্তব সমস্যার সামনে পড়ে, নিজেদের ভিতরে

এই পালা নিয়ে এক ধরনের সমস্যা তৈরি হলো। সমস্যাটা এ জন্য তৈরি হলো যে, যদি এই পালা আদৌ আর কোনোদিনও আমাদের শোনার সুযোগ না হয়, তাহলে পালাটা যেখানে শেষ হলো, সেখান থেকে এক প্রকার কল্পিত সমাপ্তির দিকে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই যাওয়ায় কয়েকটি সমস্যা ঘটবে। সেই সমস্যাগুলো নিয়েও কয়েকটি সমস্যা : এক. সেইসব সমস্যায় পৌঁছানোর আগেই যে-যে সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে সেইগুলো স্বীকার করে নেয়া; দুই. কল্পিত সমাপ্তির দিকে যাওয়ার আগে মূল কাহিনির কতটুকু পরিবেশন করা হবে আর কতটুকু উহ্য রেখে যেতে হবে তা চিহ্নিত করা; তিন. ইসলাম উদ্দিন পালাকার কাহিনিকে বা গল্পটিকে যে মধ্যবিত্ত আবহের বাইরে রেখে পরিবেশন করেছেন অথচ তা করছেন এক মধ্যবিত্ত সমাজে ও শিক্ষায়তনে—সেখানকার আবহগুলোকে ধরার চেষ্টা করা। যদিও কাগজ-কলমে এমন আয়তনে বাঙালির গল্প বলার কৌশলগুলোকে যেভাবেই সাজানো হোক না কেন, এ কথা সত্যি আমাদের রুচিবোধের যে গণ্ডি ও মাত্রা চিহ্নিত হয়ে আছে তার বাইরে যাওয়া খুবই দুষ্কর। ফলে ইসলাম উদ্দিন পালাকারের রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর পালা আমরা যে জায়গা থেকে নিজেদের প্রয়োজনে অসমাপ্তকে সমাপ্তকরণের দিকে নিয়ে যাব—সেই জায়গা থেকে এর গড়ন আমাদের প্রচলিত গল্প রচনার কাঠামোতেই রাখার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

এসব সমস্যাকে বাদ রাখলে কাহিনি সরল। আমাদের লোককাহিনিগুলো সরলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রচলের বাইরে সে যায় না; লোককাহিনি এগোতে এগোতে কাহিনির ভরকেন্দ্র নির্ধারণ করে। সেখানে আলগা চাপ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কাহিনি আপন সুতায় গাঁথা হয়ে এগিয়ে চলে।

এখন প্রথমেই যে কারণে ইসলাম উদ্দিন পালাকার প্রায় দেড় ঘণ্টার পালাখানা গেয়েও কেন পালাটা শেষ করতে পারলেন না, তা জানি। এটা অনেকটা কোনো খেলা খেলতে নামার আগে তার নিয়ম জানার মতো। কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কিন্তু আমরা

তো এক অর্থে ইসলাম উদ্দিন রচিত ও কথিত কাহিনিটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলবই। কেননা সময় স্বল্পতার জন্য ইসলাম উদ্দিন তার পালাটা শেষ করতে পারেননি।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল : পুঁথি পাঠ, মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে পাঠ ও সংগীত সহযোগে পরিবেশনা আর সাঁওতালি নৃত্য। ঘোষক জানিয়েছিলেন, সুদূর দিনাজপুর থেকে আগত সাঁওতালরা নৃত্য পরিবেশন করবেন। যদিও অনেকদিন ধরেই সুদূর আর কোনো কার্যকর শব্দ নয়। সুদূর তার দূরতা হারিয়েছে। তবু আটজন সাঁওতাল তরুণীর মঞ্চে ওঠা আর সাঁওতালি গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান পরিবেশন—সুদূর শব্দটিকে এক অর্থে এই জন্য যথার্থ করে তুলেছিল যে, এত কাছে আসার পরেও এত দূরে। গোরা উপন্যাসে জলযানের ডেকে ভোরে ঘুমন্ত সুচরিতাকে দেখে বিনয়ের যেমন মনে হয়েছিল, এত কাছে তবু এত দূরে। না, তরুণীদের নৃত্যভঙ্গিমা নয়, সাঁওতালি ভাষায় যে-গান গাচ্ছিলেন এক মধ্যবয়স্কা সাঁওতাল নারী—সেই গানের কথা ও সুরের জন্যও নয়, যে দুজন ঢোল ও মাদল বাজাচ্ছিলেন তাদের নির্লিপ্ত ভঙ্গির জন্যও নয়, এমনকি সাঁওতাল তরুণীরা যে কেউ কেউ ঠিকঠাক হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারছিলেন না ঠোঁটে, সে জন্যও নয়; চারপাশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দর্শকের সঙ্গে ওই মঞ্চের, ওই ঢোল ও মাদলের ধ্বনির, ওই অশ্রুত গানের সুর ও কিন্নর কণ্ঠের যে দূরত্ব তা তো কোনোভাবে মোচন করে তোলা যায়নি, সেখানে মিলন ঘটানোর চেষ্টা চলে—কিন্তু শত ঐকান্তিকতার পরেও কবে ঘটবে সে মিলন, কে জানে? তা তখন মনে হতে হতে ওই সুদূর শব্দটির লাগসই হয়ে যাওয়াটা কেন যেন গায়ে লাগা থেকে গা-সওয়া হয়ে গেল। না, এ নিয়ে কোনো আপত্তি নেই।

পাশে বসা কবিকে বললাম, 'জানেন, সুনীল-শক্তির সঙ্গে সাঁওতাল রমণীর প্রেম হয়েছিল।'

তিনি নৃত্য দেখছিলেন। আমার তুলনায় মনোযোগী চোখে, হয়তো। অন্য মন্তব্য করলেন। সেই মন্তব্যের সূত্র একটু আগে

আমি খুলেছিলাম, 'এদের প্রতিটি পদক্ষেপে পা থেকে কোমর যে বাঁক নেয়, বাঙালির পক্ষে এই সঞ্চালন অসম্ভব।'

আমার আগের কথার সূত্রে তিনি জানতে চাইলেন, 'কোন বইতে?'

'অরণ্যের দিনরাত্রি।'

'হ্যাঁ, সন্দীপনের কলকাতার দিনরাত্রিতেও অমন কিছু একটা আছে।'

'শক্তি হাত ভাঙলে হাতে গামছা পেঁচিয়ে তাঁকে শুচু করিয়েছিলেন তাদের বন্ধু ভাস্কর দত্ত।'

একটু হাসব আমরা। কোনো সাঁওতাল রমণীদের সঙ্গে দুই বাঙালি কবি প্রেম করেছিলেন কি করেননি—যেখান থেকে নিজেদের আলোচনা অন্যত্র গড়ানোর আগে, সাঁওতালদের নিয়ে ডকুমেন্টারিতে যেমন দেখা যায়, সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুকে যেমন আছে, মমতাশঙ্কর সাত-আটজন সাঁওতাল রমণীর সঙ্গে হাত বেঁধে তাল ঠুকে পা একবার সামনে একবার পিছনে এনে যেভাবে নাচতে শুরু করে—এটাই বোধহয় সাঁওতাল নৃত্যের শেষ দিক—আমরা তাই দেখতে দেখতে পিছনের কথা হারাই। মেয়েরা ধীরে ধীরে পিছনে যায়, সামনে এগোয় আবার তাল ঠোকে আর মঞ্চ থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

দর্শক করতালি দেয়। এরপর আয়োজকদের কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে—সেগুলো শেষ করে। সাঁওতাল সাংস্কৃতিক দলের প্রধানকে স্মারক দেওয়া হয়। উন্মোচন করা হয় এই অনুষ্ঠানের স্মরণিকা। এর ফাঁকে ঘোষক বার কয়েক প্রায় বিজ্ঞাপন তরঙ্গের ভাষায় ইসলাম উদ্দিনের পালাগানের ঘোষণাও দেয়।

ইসলাম উদ্দিন পালাকারের পালাগানের জন্য দর্শক অপেক্ষা করে।

ততক্ষণে রাত প্রথম প্রহর কাটিয়েছে প্রায়। দশটা পার হয়েছে। ইসলাম উদ্দিন পালাকার যখন মঞ্চে আসেন তখন ঘড়িতে দশটা পেরিয়ে দশ মিনিট।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইসলাম উদ্দিন পালাকার মঞ্চে আসার আগে দর্শকদের প্রতিক্রিয়াটা ঠিক বোঝা যায়নি।

দর্শকদের ভিতরে দুটো পক্ষ। এক পক্ষ ইতিপূর্বে তার পালা দেখেছে, অন্যরা দেখেনি। যারা দেখেনি তাদের ভিতরেও আবার দুটো ভাগ। এক দল আগে ইসলাম উদ্দিনের পালা সম্পর্কে শুনেছে, অন্যরা শোনেনি। এছাড়া দর্শকদের তারতম্য তো আছেই। তা বয়সের, যদিও এখানে একদমই কম। কারণ, বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষক-কর্মচারী। বাইরের কেউ কেউ আছে, তাদের সংখ্যা কম। শিশু বা কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা আরও কম।

ফলে মঞ্চে ইসলাম উদ্দিন পালাকার আসার আগে তার সঙ্গে যারা সংগত করবেন, তাদের দেখে এই আসর কেমন হবে সে সম্পর্কে ঠিক ধারণা করা যায় না। মনে হচ্ছে, এটা কোনো কাওয়ালি গানের আসর, বড়জোর পদাবলি কীর্তনগানও হতে পারে।

কিন্তু মঞ্চের বাম দিক দিয়ে ইসলাম উদ্দিন ঢোকামাত্রই মঞ্চের ও দর্শকের ধরন ও ধারণা বদলে গেল। ইসলাম উদ্দিন বাদশাহি পোশাক পরে মঞ্চে এলেন। রং ঈষৎ লাল অথবা মঞ্চের আলোতে তা ঠিক বোঝাও যায় না; একটু ঢোলাও—উপরের দিকে তার গায়ের মাপেই তৈরি, কিন্তু নিচের দিকে এমন কুঁচি দেওয়া যে পোশাকটা পুরোপুরি পুরুষের বলে ঠিক মনে হয় না, আবার মেয়েদের পোশাকও এটা নয়। ইসলাম উদ্দিনের গলায় কতগুলো হার। কোনোটা লম্বা, কোনোটা প্রায় গলার কণ্ঠার হাড়ের

কাছাকাছি। যেটা সবচেয়ে বেশি লম্বা, সেটা প্রায় নাভি অবধি।

ইসলাম উদ্দিন পালাকারের গায়ের রং কালো। চোখ দুটো বড় ও আয়তাকার। মুখটা একটু লম্বা, নিচের দিকে সুচালো, অনেকটা ইরানি নারীর মতো। তা বলে এই কথা কওয়া যাবে না, ইসলাম উদ্দিন দেখতে রমণী-রতনের মতন। তার মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য ওই। শরীরে এক রত্তি মেদ নেই, কোমর সরু, চাইলেই দম টেনে তার পেটখানা পিঠের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেন, প্রয়োজনে তা মিলিয়ে নিয়েওছিলেন তিনি পরে অভিনয়কালে। আর মাথাভরতি চুল, লম্বায় কোমর পর্যন্ত—প্রয়োজনে এখানেও তার কুদরতি—সেই চুল ঝাঁকিয়ে একবার সামনে আনেন—ঝুঁকে মাথাটা তখন নিচের দিকে দেন, আবার পিছিয়ে পিঠের সঙ্গে বাড়ি খাওয়ান সে চুল। এটা তিনি পরে করেছিলেন যখন পালাগানের কোনো পর্যায়ে একবার দুবার তালের সঙ্গে তার এই চুলের বাহার দেখানোর প্রয়োজন পড়েছিল।

তো ইসলাম উদ্দিন পালাকার মঞ্চে হাজির হওয়ামাত্র মঞ্চের চেহারা বদলে গিয়েছিল, এ কথা আগেই কবুল করেছি। দর্শকদেরও। এমন ঝলমলে চেহারার একজন যুবক, এখনও কোনো কথা বলেননি, মঞ্চের সব ক'টি আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সেই আলোয় দর্শকরা এমন নন্দিত চেহারার একজন মানুষকে দেখে যাকে বলে বিস্মিত। পিছন থেকে কে যেন বলল, জটিল! আজকাল তরুণরা বিস্ময়কে ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে সকল শব্দ ব্যবহার করে থাকে এটি তার একটি। একদিন এই শব্দগুলোর জায়গায় অসাধারণ ব্যবহৃত হতো, এখন হয় না; আনন্দে মারহাবা বলার চল ছিল একসময়ে তাও আজকাল তেমন শোনা যায় না। তার বদলে জটিল, ভয়ংকর, জোস, ফাটাফাটি; আরও আপ্লুত হলে 'ফিদা' ইত্যাদি বলে থাকে তারা।

একজন কর্ডলেস মাইক্রোফোন দিয়ে যায় ইসলাম উদ্দিন পালাকারের হাতে। এর আগে মঞ্চের সামনের দিকে পরপর তিনটি স্ট্যান্ডে বসানো মাইক্রোফোনের সামনে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু একটা বলার ভঙ্গি করে ফিরে গিয়েছিলেন,

হয়তো কিছু বলেওছিলেন; দর্শকরা তখন তার উপস্থিতিতে এতটাই উৎফুল্ল যে ওই মাইক্রোফোনে ফুঁ দিয়ে ফিরে যেতে যেতে যদি তিনি কিছু বলেও থাকেন, তা তারা শোনেনি। কিন্তু এবার কর্ডলেস মাইক্রোফোনটি হাতে পাওয়ামাত্র ইসলাম উদ্দিন পালাকার হেসে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। তারপরমুহূর্তে চোখ ও মুখে এক প্রকার নিজস্ব ভঙ্গি করে তার আজকের পালার নাম জানান। আমার আজকের পালার নাম : রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর পালা।

এই পর্যন্ত আসতে, ইসলাম উদ্দিন পালাকারের এই কথা পর্যন্ত বলতে, তার এই মনোভঙ্গিটুকু পড়ে নিতে, পড়ে নিয়ে এইখানকার দর্শকদের, অন্তত যাদের ইতিপূর্বে পালা দেখার কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাদের ভিতরে ভিতরে কী কী বোধ সঞ্চারিত হয়েছে তার একটি হিসাব নেয়া যেতে পারে।

এখানে খোলা প্রান্তরের এক পাশে স্থায়ী মঞ্চ। প্রান্তর ঠিক না, ছাত্ররা বিকেলবেলা প্যান্ট গুটিয়ে ফুটবল-ক্রিকেট খেলে এমন একটি মাঠ এটি। শব্দটি লক্ষণীয়, প্যান্ট গুটিয়ে। মানে প্রকৃত খেলার মাঠ এটি নয়। স্থায়ী কোনো গোলবার নেই। ক্রিকেট মাঠে স্থায়ী না হলেও যেমন পিচ থাকে, তেমন কোনো পিচও এখানে নেই। ফুটবল খেলা হয় পুবে-পশ্চিমে গোলবার কল্পনা করে। ক্রিকেট হয় উত্তর-দক্ষিণে বল ছুড়ে। সম্প্রতি মাঠের দক্ষিণ দিকে স্থায়ী কংক্রিটের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের আদল বুঝে বাঁশ পোঁতা হয়, টাঙানো হয় শামিয়ানা। ইসলাম উদ্দিন পালাকারের এই গান তথা দুই দিনব্যাপী আদিবাসী লোক-উৎসবের এই অনুষ্ঠানে একটি বহুজাতিক মোবাইল ফোন কোম্পানি, বহুল প্রচারিত একটি দৈনিক ও একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল অর্থ ও প্রচারের সহায়তা দিয়েছে। মঞ্চের পিছন দিকে যে বিশাল আকৃতির ব্যানার ঝোলানো হয়েছে সেখানে তাকালেই পড়ে নেয়া যায়। তা এমন বড় ও বহুজাতিক কোম্পানির সৌজন্য যে আদিবাসী লোক-উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে মাঠের মঞ্চ সোজা প্রায় সারা মাঠ। এই মঞ্চে

দর্শক সাধারণত যেসব অনুষ্ঠান দেখায় অভ্যস্ত, যেখানে পারফর্মার পরিবেশনা শুরু করার আগে যেভাবে কথা বলেন, ইসলাম উদ্দিনের কথার ধরন ঠিক সেই প্রকারে গেল না।

যদিও ধারণা করা যায়, এতক্ষণে এই অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকদের সেখান থেকে সরিয়েও নিয়ে এসেছে। তবু ইসলাম উদ্দিন পালাকার তার পালা শুরু করার আগে বলেন, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। কিন্তু সেই বলার ধরনটি বেশ ভিন্ন।

আগেই বলেছি, ততক্ষণে মাইক্রোফোনটি তার করতলগত। একবার কথা বলেই এর ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। ভালোমন্দও বুঝে গেছেন। তিনি আর এটিকে নিয়ে ভাবলেন না। বাম হাতে ওই যে এটাকে একবার ধরলেন, দ্বিতীয়বার আর এটিকে ডান হাতে নিলেনও না।

এরপর বন্দনা শুরু করলেন।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ করার মতো। এখনকার প্রচলিত কাহিনি থেকে বন্দনা উঠে গেছে। আজকাল কোনো কোনো কাহিনিকার তো প্রায় বলতে গেলে কাহিনির একদম মাঝখান থেকে গল্প বলা শুরু করেন। যেন অনেকখানি আগে বলা হয়ে গেছে। যেন এই কাহিনির আগে অনেকখানি ছিল, সেটুকু এই মুহূর্তের পাঠককে না জানালেও চলে। যদিও কেউ কেউ প্রায় এক দেশে ছিল এক রাজা ধরনের, কেউ-বা প্রকৃতির এমন বর্ণনা দিয়ে শুরু করেন যে, যেন সেখানে গোটা জীবনটা বেশ শান্ত-সমাহিত ছিল, সে জীবনে এর আগে কোনো গল্প ছিল না, এইমাত্র শান্ত সমাহিত আর নিস্তরঙ্গ জীবনের ভিতর দিয়ে একটি গল্প হেঁটে চলে বেরিয়ে গেল—সেই গল্প এই প্রথম আমরা পাঠ করতে শুরু করলাম।

সেখানেও কিন্তু একটা সমস্যা থাকেই। সেটা কেমন? ওই যে রাজারানির কাহিনি কি নিস্তরঙ্গ গ্রাম কি জনপদের ভিতরে মানুষ—যাদের কথাই বলা হোক, একটু খেয়াল করলে দেখা যায় এর আগেও কিন্তু সেই জীবন বহমান ছিল, আর ওই যে গল্পটি

যেখানে গিয়ে শেষ হবে, তারও পরে কিন্তু ওই গল্প চলতে থাকবে।

যেমন, আমাদের এই গল্পের শুরুও কিন্তু গল্পের মাঝখান দিয়েই। একটি গল্প আমাদের সামনে চলমান ছিল, গল্পটি বয়ান করছিলেন ইসলাম উদ্দিন পালাকার, রাত বেশি হয়ে যাওয়ায়, আবাসিক হলগামী ছাত্রীদের কথা বিবেচনায় রেখে, কর্তৃপক্ষ যতটুকু সময় এই অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন তাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে তা শেষ হয়ে যাওয়ায় অথবা হতে পারে ইসলাম উদ্দিন পালাকারের এই রাত্তিরেই কিশোরগঞ্জ ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন থাকায় তিনি রূপকুমার আর হরবোলাসুন্দরীর বাসর ঘরের কাহিনি পর্যন্ত বর্ণনা করেই পালা আজকের মতো শেষ করে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, কোনোদিন সুযোগ পেলে এই কাহিনির বাকিটুকু আমাদের শোনাবেন—সেই হিসাবে এই কাহিনি এক অসমাপ্ত কাহিনির মাঝখান দিয়ে শুরু করা। আবার, ইসলাম উদ্দিন পালাকার তার কাহিনি যে জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন, যদি সেই জায়গা থেকে ধরি যে, গওহরজান বাদশার একমাত্র ছেলে রূপকুমার—সেটাকেও তো বিবেচনা করা যায় কাহিনির মাঝখান। কেননা, এর আগে ওই ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ এলাকায় গহওরজান বাদশার রাজত্ব ছিল, রূপকুমারের আগে গওহরজান বাদশার জীবন ছিল, হয়তো বাদশার বাপও বাদশা ছিল, হয়তো তার বাপও বাদশা ছিল। আমরা জানি না। সেই কথা আমাদের জানার প্রয়োজনও পড়ে না। জানতে চাই না। কাহিনির এই মাঝখান দিয়ে শুরু করা নিয়ে তাই আমরা ভাবি না। আমরা রূপকুমারের কাহিনি পালাকার ইসলাম উদ্দিনের মুখে শোনার জন্য বসেছি। একইভাবে বইয়ের পাতায় কোনো নভেল-নাটক গল্প-উপন্যাস পালা-কিচ্ছা, মহাকাব্য কিংবা আজকাল যেভাবে জীবনী লিখিত হয়, এর কোনো-কোনোটি যখন খুলে নিয়ে বসি সেখানেও কাহিনির মাঝখান বা একেবারে গোড়াগুড়ি দিয়ে শুরু হওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা খুব ভাবিত হই না। আবার যেখানে কোনো কাহিনি শেষ হয়ে যায়, তারপরেও তো কাহিনি থাকে, সেইখানে পৌঁছানোর

পরে বইয়ের আর পৃষ্ঠা থাকে না, আমরা বইখানা বন্ধ করে রেখে দিই বা খোলাই রাখি—যেমন পালা শেষ হলে উঠে যাই। কেউ ভাবি, এরপরও তো কাহিনি আছে, সেই কাহিনি আমাদের জানা হলো না। যদিও আমরা জানতেও চাই না সেই কাহিনিতে কী আছে; এমনকি হঠাৎ কোনোদিন রচয়িতার সঙ্গে দেখা হলেও। কিন্তু এই রাতে ইসলাম উদ্দিন পালাকার তার পালার কাহিনি যেখানে রেখে আসর শেষ করলেন, তাতে কাহিনির অনেকখানিই জানতে আমাদের বাকি থেকে গেল। আমরা ধরে নিতে পারতাম, রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর কাহিনি ওই বাসর ঘরেই শেষ। কিন্তু ইসলাম উদ্দিন পালাকার আমাদের কাহিনির এমন এক জায়গায় রেখে চলে গেছেন যে, এই কাহিনি আমাদের ভেবে নিতেই হচ্ছে। অথবা অসমাপ্ত কাহিনি শোনার পরে নিজেরা যেভাবে সেই কাহিনির পরের অংশগুলো তৈরি করে নিই, সেভাবে বাকি কাহিনি তৈরি করে নিতে হচ্ছে।

ইসলাম উদ্দিন পালাকার বন্দনা শুরু করেন।

তার গলার স্বর দৃঢ়। কিন্তু এর ভিতরে কোথায় যেন একটু ঝাঁজ মেশানো। একটু ময়মনসিংহের টানও আছে সেই ঝাঁজের সঙ্গে। এটা তিনি ইচ্ছে করে রপ্ত করেছেন তা মনে হলো না। তবে গলার স্বরে জিভের ওঠানামায় এক ধরনের টান খেলাতে পছন্দ করেন সেটি খুব বোঝা যায়। তবে বন্দনায় তো কাহিনি কথনের কোনো প্রকার চাপ থাকে না, তাই গলার ওঠানামারও তেমন প্রয়োজন পড়ে না; যেটির প্রয়োজন পড়ে তা হলো, নিজেকে এই প্রস্তাবনার ভিতরে সমর্পণ করে দেওয়া। বাংলা লোককাহিনিতে, পালায়, কীর্তনে, বিচারগানে এই প্রকারের সংযোগ ও সমর্পণের বিষয়টি দীর্ঘ দিন ধরে ছিল, এমনকি প্রথম দিককার আখ্যানে প্রচ্ছন্ন হলেও; মঙ্গলকাব্যে তো ছিলই, বাংলায় অনূদিত মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতে ভণিতা খুব পাওয়া যায়।

ইসলাম উদ্দিন পালাকার যে আল্লা আর মা ও বাপে তাকে সৃষ্টি করেছেন তাদের স্মরণ করলেন। পূর্বদিকে প্রতিদিন ওঠা সূর্যকে বন্দনা করলেন ভানুশ্বর নামে, এর আলোতে প্রতিটি দিন

আমরা আলোকিত হই সে কথা জানালেন সঙ্গে। উত্তরের হিমালয় পর্বতকে বন্দনা করলেন। পশ্চিমে নবি ও কাবাগৃহ আর কিতাব কোরান; দক্ষিণে কালিদহ সাগর মানে বঙ্গোপসাগরকে বন্দনা করলেন। আর নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়াবাসী তার ওস্তাদকে সালাম জানিয়ে জানালেন নিজের সাকিন—গ্রাম : নোয়াবাদ, থানা : করিমগঞ্জ, জেলা : কিশোরগঞ্জ।

এখানে নেত্রকোনার কেন্দুয়া উল্লেখের একটা তাৎপর্য আছে। যেমন গল্প-উপন্যাসে থাকে প্রায় যেন সে রকম। এটা একটা ইঙ্গিত। কেননা, গওহরজান বাদশার 'বখে যাওয়া' পুত্র রূপকুমারের জন্য পাত্রী খুঁজতে তার উজির নেত্রকোনার কেন্দুয়া গিয়েই উপস্থিত হবে। সেখানে এক ফুলের বাগানে বিশ্রাম নেয়ার সময়ে পুকুরে গোসল করতে আসবে বারো বছর বয়েসি হরবোলাসুন্দরী। আর তাকে দেখে মুগ্ধ হবে উজির, ভাববে এই মেয়ের সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে হলেই রাজকুমার বিলকিস মালিনীর খপ্পর থেকে রক্ষা পাবে। ফলে, নেত্রকোনা ও কেন্দুয়া—এই স্থাননামগুলো গোড়াগুড়িতেই মাথায় রাখা দরকার।

বন্দনা শেষ হলে ইসলাম উদ্দিন একটু থামলেন। দ্রুত হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, পালার নাম বললেন, এই পালাটা আমাদের সামনে পরিবেশন করবেন জানালেন। দুই কদম পিছনে গেলেন। যেখানে সঙ্গীরা তার প্রায় কাছাকাছি। একবার জিহ্বায় জড়িয়ে বললেন, শুরু করছি, রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর পালা।

যা জানানো হয়নি : ইসলাম উদ্দিন পালাকার বন্দনা ও পালার নাম বলার ভিতরে পালাগায়ক হিসাবে বার দুয়েক তার চুলের কারিশমা দেখিয়েছেন, চাহনির খেলা দেখিয়েছেন। তবে এ এক সূচনা মাত্র। পরে ওই চোখ আর চুলের যে খেলা তিনি দেখাবেন, একটি বালিশকে ঘোড়া আর একগাছা দড়িকে চাবুক হিসাবে ব্যবহার করে শরীরী যে কসরত দেখাবেন, তা তখন পর্যন্ত উহ্য। তা দেখার আগ্‌পর্যন্ত এইটুকুই কাফি। এটুকু দেখেই বোঝা গেছে, তার ঝোলায় আরও অনেক রঙ্গ তখনও অবশিষ্ট।

তৃতীয় দৃশ্য

এবার কাহিনিটি জানি। অন্তত যত দূর ইসলাম উদ্দিন পালাকার আমাদের জানিয়েছেন।

রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর কাহিনিটি ইসলাম উদ্দিন পালাকারের নিজের কি না জানা যায়নি। হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। তবে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে যেটুকু জানা আছে, তাতে অনুমান এমন অনেক কাহিনি ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত। হতে পারে তার একখানি এই পালাকার নিজের মতো করে পরিবেশন করেছেন। আবার হতে না-ও পারে। হতে পারে ওই অঞ্চলে বহুকাল ধরে প্রচলিত এসব কাহিনির আদলে একেবারে নিজের মতো করে একখানি কাহিনি তিনি তৈরি করে নিয়েছেন। তা যাই তৈরি করে নিন, কি একখানি প্রচলিত কাহিনিকেই নিজের মতো করে পরিবেশন করুন, সারা দুনিয়াতেই প্রেমের গল্প প্রায় এক, বিরহের গল্পও প্রায় তাই। এই নিয়ে একটি অমোঘ বাক্য লিখেছেন লেভ তলস্তোয় তাঁর আন্না কারেনিনার শুরুতে : 'সুখী পরিবারগুলো একে অন্যের মতন।' কিন্তু এর পরের বাক্যটির জন্যই পৃথিবীময় এখনও এত গল্প-কাহিনি রচিত হয় : 'প্রতিটি অসুখী পরিবার নিজস্ব নিজস্ব কারণে অসুখী'। তলস্তোয় জানাচ্ছেন, প্রতিটি অসুখিতার ধরন আলাদা।

এখানেও তাই। প্রণয়কাহিনির ধরন প্রায় একই, শুধু বিচ্ছেদি গল্পের ধরন ভিন্ন। কারণ, প্রতিটি বিচ্ছেদের ধরন আলাদা। আবার প্রতিটি প্রেমের গল্পের শেষে যেমন থাকে, অতঃপর তাহারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল, এই সুখে-শান্তিতে বসবাস

করার আগে, নায়িকার নায়ককে অথবা নায়কের নায়িকাকে পাওয়ার অংশটুকুও কিছুটা ভিন্ন। সেই ফারাকের আলাদা আলাদা ধরন থাকলেও কাহিনির গন্তব্য কিন্তু শেষতক একই। কাহিনিতে লেখক, চলচ্চিত্রে পরিচালক, পালায় পালাকার তাহাদের সুখে-শান্তিতে বসবাস করিবার সুযোগ করিয়া দেন।

এইখানে বিষয়টা অবশ্য আরও এককাঠি সরেস।

মঞ্চে উঠেই যখন ইসলাম উদ্দিন পালাকার জানিয়েছেন, এটি রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর পালা—তখনই দর্শক আর শ্রোতাদের ভিতরে এই রসায়ন প্রবল পরাক্রমে প্রবাহিত হয়েছে যে, তারা একটি প্রেমকাহিনিই শুনতে যাচ্ছে। ইসলাম উদ্দিন পালাকারের এ কথা বলার সময়ে মুখে হাসি আর চোখের যে ইঙ্গিত তাতেও তো বোঝা গেছে, এই কিচ্ছায় যত প্যাঁচই থাকুক, এটি আসলে একটি প্রেমকাহিনি। শেষ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রী সুখে আর শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিবে। আমরাও জানতাম তাই হবে, তাই শেষ পর্যন্ত কাহিনির গন্তব্য।

গওহরজান বাদশার একটি মাত্র ছেলে। নাম : রূপকুমার। এটা রাজা-বাদশার কাহিনি। রাজতন্ত্র বাংলা অঞ্চল থেকে ক্লাইভের অধিকারের পরে অন্তর্হিত হয়েছে আমরা জানি। তারপরও বড় ও ছোটো সামন্ত প্রভু এবং জমিদার তালুকদার ভূঁইয়া চৌধুরী রায়বাহদুর খানবাহাদুর পদবি ও উপাধিধারীকে বাংলা অঞ্চলে রাজা বলার প্রবণতা আছে। জমিদারবাড়িকে রাজবাড়ি বলা হতো এই সেদিনও। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে বড় জমিদারকে রাজা-মহারাজা বলার চল ছিল। নবাবও বলা হতো। সেই হিসাবে ইসলাম উদ্দিন পালাকারের এই গল্পের গওহরজান বাদশা ধরে নিচ্ছি খুব বেশি দিন আগের নয়। তা যেদিনেরই হোক, যখনকারই হোক, গওহরজান বাদশার একমাত্র ছেলে রূপকুমার। ছোট্ট ছেলে। তাকে রাজা সর্বগুণে গুণী করে তুলতে চান। নিশ্চয়ই সব রাজকুমার সেভাবেই বড় হতো বা হয়। রূপকুমারের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। যদিও রাজার সেই প্রত্যাশার কথা পালাকার বলেননি। এটা অনুমান। কিন্তু ছেলেটি

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পাঠশালায় যায়। ইসলাম উদ্দিন পালাকারের ভাষায় প্রাইমারি ইস্কুলে যায়। তারপর প্রাইমারি ইস্কুল থেকে সে ধীরে ধীরে হাই ইস্কুলে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

কাহিনির মূল গৎ আসলে এই জায়গা থেকে শুরু। আগে তো রাজপুত্র রূপকুমারের ষোলো বছর বয়স হতে হবে। রূপকুমারের ষোলো বছর বয়স না হলে সে প্রেম করবে কী করে? অন্তত ষোলো বছর বয়সটা রাজকুমারের প্রেম করার জন্য উপযুক্ত। কাহিনিতে যতই প্রাইমারি ইস্কুল হাই ইস্কুল এই বিষয়গুলো থাকুক, এটা তো এইসঙ্গে চলবে যে রাজপুরুষের প্রেম পালা গানে ষোলো বছরেই হয়। অথবা, হতে পারে পুরুষ ষোলো বছর বয়সে প্রথম প্রেমে পড়ে অথবা প্রেমে পড়তে শেখে। সেইমতো পালাকার রূপকুমারকে ষোলো বছর বয়সের কোনায় এনে দাঁড় করালেন। যাতে কাহিনিতে রাজপুত্র আর তার কৈশোরক প্রেমের ভিতর দিয়ে কাহিনির এক নির্দিষ্ট আদল দিতে পারেন। সঙ্গে এটাও হয়তো তার উদ্দেশ্য, যদি এই প্রেমটি রূপকুমারের এক পরিণত বয়সের বিষয় হয়, তাহলে তার নিজস্ব ভালোলাগা মন্দলাগার বিষয়গুলোও এর সঙ্গে এসে জুড়ে বসতে পারে। সে তার বাবার অবাধ্য হতে পারে। প্রয়োজনে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। যেমন করেছিলেন শাহজাদা সেলিম, আনারকলি নামের এক রাজকর্মচারিণীর মেয়ের জন্য। সেই প্রেম অমর হয়ে আছে কাহিনিতে। আকবর বাদশা নিজেকে মহৎ করেছেন, সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরও হয়তো মসনদের উত্তরাধিকার হিসাবে সব মেনে নিয়েছেন, আনারকলিকে ত্যাগ করেছেন। তবু বাংলা ছায়াছবির গানে তো এই কথা গায়িকার কিন্নর কণ্ঠে গীত হয় : 'আনারকলি সেলিমের প্রেম কাহিনি, যত দিন রবে ওই যমুনাতে পানি' ততদিন অমর থাকবে।

আবার একটু পিছনে তাকিয়ে এই কথাও মনে হয়, ইসলাম উদ্দিন পালাকার বিলকিস মালিনী আর রূপকুমারের অংশটুকু যেন কোনো জানা কাহিনি থেকেই নিয়েছেন। তা নিতে পারেন। পৃথিবীর প্রায় সব প্রেমকাহিনি শেষ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞাতই।

রূপকুমারের ষোলো বছর বয়সে পৌঁছানো তাই ইসলাম উদ্দিন পালাকার ও দর্শককুলের জন্য জরুরি ছিল। ইসলাম উদ্দিন প্রাইমারিতে পড়া রূপকুমারকে নিয়ে কাহিনি কত দূরে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন? এদিকে এখানে যারা উপস্থিত, তারা এই কাহিনিতে যা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছে আখ্যানে সেই আস্বাদ তো পাচ্ছিল না। ফলে রূপকুমারের অন্তত ষোলো বছর আর একটি প্রেমকাহিনির জন্য অপেক্ষা মুহূর্তের ভিতরেই ফুরাল, যখন ইসলাম উদ্দিন পালাকার চোখ জোড়া একটু বড় করে, দর্শকের দিকে তাকিয়ে আর হেসে—যেন এই মুহূর্তে এক গূঢ় সত্যের ইঙ্গিত দিয়ে কাহিনিকে নতুন মোচড় দিয়ে নতুন একটি দৃশ্যে নিয়ে যাচ্ছেন।

জানালেন, এইভাবে একদিন ষোলো বছর হইল রূপকুমারের!

ঢোলে খুব জোরে বাড়ি পড়ল, মন্দিরা বাজল, ডফকিতে ফুটল বোল। মঞ্চের বাম দিকে, অর্থাৎ ইসলাম উদ্দিনের পিছনে ডানের হাতায় যিনি ডফকি বাজান আর ইসলাম উদ্দিন পালাকারের কথায় সংগত দেন, তিনি একটু উলটো গলায় বললেন, 'ষোলো বছর! এইবার ঘটনা।'

এতে দর্শকদের ভিতরে কোনো হাসির রোল উঠবে না সত্যি, কিন্তু দর্শক মজা পেল। তার এই টিপ্পনিতে দর্শকের মজা আর একইসঙ্গে কাহিনির ভিতরকার ইঙ্গিত কিন্তু ঠিকই কার্যকর থাকে। এটা পালাকারের বিশেষ সুবিধা, গল্পলেখক এই সুবিধা সাধারণত পান না—তার বর্ণিত কাহিনির কোথাও কোনো ইঙ্গিত থাকলে তা হঠাৎ কাহিনি-লগ্ন করে সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার মতো খুব সুযোগ থাকে না। তবে গল্পলেখক নিজেই হয়তো তখন একটি উদাসী বাক্যে অথবা ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যে কখনো কখনো সেই লবজটাকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

যে ঘটনার ইঙ্গিত দিলেন ইসলাম উদ্দিন পালাকারের সংগতকার, সেই ঘটনাটাই এখন ইসলাম উদ্দিন পালাকার জানাবেন। হ্যাঁ, একদিন ইস্কুলের পড়া শেষে রাজপুত্র রূপকুমার

ঘোড়া নিয়ে ছুটছে তো ছুটছে, কত দূরে যাচ্ছে সে নিজেই জানে না। বাংলা পালায় এমন ঘটে, যখন রাজকুমাররা ঘোড়া নিয়ে দূর দেশে ছুটে চলে তখন কত দূরে যায়, কোথায় যায় তার কোনো হদিস থাকে না। আর এই যাওয়াটা ঘটে তখনই যখন এমন প্রেমে পড়ার কোনো বিষয় ঘটে, কোনো গোলকধাঁধায় পড়ার বিষয় আসে, কোনো কুহকে পড়ার বিষয় থাকে। কখনো থাকে হয়তো কোনো প্রেমে, কোনো ডাইনির আশ্রয়ে, কোনো রাক্ষসীর বশে অথবা রাজা যখন রাজ্য হারাবে।

ফলে, এই জানা বিষয়টি নিয়েই ইসলাম উদ্দিন পালাকারের এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু বিষয়টা একইসঙ্গে হালকা আর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল এই জন্য, ইসলাম উদ্দিন পালাকার তার দুই ঊরুর মাঝখানে পিছন থেকে দেওয়া বালিশটা রেখে আর ডান হাতে একগাছা দড়ি নিয়ে শরীরটাকে সামনের দিকে ভাঁজ করে আবার পিছনের দিকে নিয়ে অতি দ্রুত কিন্তু প্রায় নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে, আবার ছোট্ট ধাপ দিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে ঘোড়ায় দিগ্বিদিক ছুটে চলার যে শরীরী ভাষা প্রকাশ করলেন, তা অসাধারণ! ইসলাম উদ্দিন তার অঙ্গভঙ্গির কারিশমার খানিকটা দেখালেন, তাতে গল্প তরলতা থেকে গূঢ় হলো না, কিন্তু রূপকুমার কত দূর পথ গিয়েছে তা বোঝা গেল। জানা গেল, এই এতটা পথের ক্লান্তি, ইসলাম উদ্দিন পালাকার নিজের কপাল থেকে ঘাম ঝাড়লেন। বোঝা গেল রূপকুমার ক্লান্ত। এতটাই ক্লান্ত যে তার পানির তেষ্টা পেয়েছে। তখন রূপকুমার ফুলের বাগানে গাছের ছায়ায় বসেছে, কিন্তু তেষ্টায় তার বুকের ছাতি প্রায় ফেটে যায় যায়—এই জায়গা থেকে একটু দূরে পুষ্করিণীর কোনায় দেখতে পায় একটি কুটির!

ইসলাম উদ্দিন পালাকার যেমন বর্ণনা করেছেন : রূপকুমার ওই কুটিরের দিকে আগাইয়া যায় আর ভাবে, এই জায়গায় নিশ্চয়ই কেউ আছে যার কাছে এক গ্লাস পানি পাওয়া যাবে। রূপকুমার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকে : ঘরের ভিতরে কেউ আছেন, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যায়, গলা শুকাইয়া কাঠ,

আমারে এক গ্লাস পানি দেবেন কেউ?

ইসলাম উদ্দিন পালাকার জানাচ্ছেন, তখন ঘরের ভিতরে ছিল রাজার মালিনীর মেয়ে বিলকিস। বিলকিস প্রথমে বুঝতেই পারে না, তারে কে ডাকে। এই যে বুঝতে না পারা, অসময়ে কে এল তার কাছে, একাকী বিলকিসের শোনা পুরুষের কণ্ঠ—এই বিষয়গুলো নিয়ে ইসলাম উদ্দিন চোখে মুখে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করেন। তাঁর প্রতিটি ভঙ্গিই উপভোগ্য। কিন্তু তখন দর্শকের চোখ তো বিলকিসের সঙ্গে রাজকুমারের কী কথা হয় তা জানতে উদগ্রীব আর একইসঙ্গে দর্শক হিসেবে এটাও প্রায় প্রত্যেকে ধরে নিয়েছে, এই তবে রূপকুমার আর বিলকিস মালিনীর প্রেমকাহিনি শুরু হলো।

বিলকিস মালিনী রূপকুমারের ডাক শুনেই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল না। ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে দেখল, কে?

দাঁড়িয়ে আছে রাজপুত্র রূপকুমার!

এতে অবশ্য বিলকিস মালিনীর প্রায় মূর্ছা যাওয়ার দশা। তার মা রাজবাড়ির মালিনী, সেই বাড়ির রাজকুমার এখন এসে তার সামনে হাজির। বিলকিস মালিনী ভাবল, কী বলে। সে কয়েকবার তা-ই ভাবল। তারপর জানাল, তার মা বাড়িতে নেই, এখন সে বাইরে বের হতে পারবে না। প্রতিটি দৃশ্য ইসলাম উদ্দিন পালাকার তৈরি করেন চলমান ঘটনার সঙ্গে সংগতি রেখে, মূল ঘটনার টান যেন কোনোভাবে দূরে সরে না যায় আর কাহিনির পরবর্তী প্রতিটি ধাপ যেন একটার সঙ্গে একটা মিলে এক নির্দিষ্ট পরম্পরা তৈরি করে; আর, কাহিনিতে এই মুহূর্তে যে আপাত রহস্য তৈরি হয়েছে তা যেন প্রতিটি পদক্ষেপেই বজায় থাকে।

বিলকিস মালিনী জানাল : মায় বাড়িত নাই, এখন সে বাইরে বের হতে পারবে না।

এই কথাটা ইসলাম উদ্দিন পালাকারও বার দুয়েক বলেছিলেন। পালার অনেক জায়গাই তিনি এমনভাবে বার দুয়েক বা তারও বেশিবার একই কথা বলেছেন শুধু কাহিনির নির্দিষ্ট পরম্পরা রক্ষা করার জন্য আর প্রসঙ্গের গুরুত্ব বাড়াতে।

একইসঙ্গে এটাও, এই যে বিলকিস মালিনী রূপকুমারের প্রথম দর্শনের এই কথা বারবার বলার ভিতর দিয়ে যেন পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও প্রেমের বিষয়টি তৈরি করা যায়।

এমন মাঝেমধ্যে ইসলাম উদ্দিন পালাকার করেন; পরেও করেছেন কয়েকবার। লেখ্যকাহিনিতে এই সুযোগ আসলেই কম থাকে। ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয় বারবার কোনোভাবেই বলা যায় না। ফলে এই যে আকৃষ্ট হওয়া—এই বিষয়টি কাহিনির সূত্র আর সংযোগের ভিতর দিয়ে তৈরি করে নিতে হয়, কিন্তু বার দুয়েক বলে ঘটনার অতিরিক্ত কোনো আবহ তৈরি করার সুযোগ সেখানে ঘটে না। ইসলাম উদ্দিন পালাকার একবার দর্শকদের দেখে নিলেন যেন। শামিয়ানার নিচে দর্শককুল, সেখানে অন্ধকার, পালাকার মানুষের চোখ দেখতে পারেন না, চোখের ভাবগতিক বুঝতে পারেন না, কিন্তু তিনি জানেন, কোন মুহূর্তে কোথায় কোথায় দর্শকদের চোখের কী অবস্থা হয়। দর্শকরা কত দূর পর্যন্ত ভেবে নিতে পারে, আর দর্শকদের কোন কোন অংশ বারবার বলে কাহিনির পরম্পরার সঙ্গে এসব জায়গায় জুড়ে রাখার প্রয়োজন আছে। তাই এই অন্ধকারে দর্শকের চোখ দেখতে না পারলেও পালাকার কাহিনির সঙ্গে দর্শককে ধরে রাখার জন্য এই কাজটি করেন।

চটুল ও ফাজিল হাসি দিয়ে খুবই ইয়ার্কির ঢঙে ইসলাম উদ্দিন পালাকার বিলকিসের মনের কথা জানান যে, বিলকিস মালিনী যখন চাইয়া দেখল, রাজকুমার তার দরজার বাইরে, তখন তার যে কী অবস্থা! বিলকিস মালিনী আরও ভেবে রেখেছে, এই একবারই তার জীবনে সুযোগ, এখন যদি রাজকুমার এই পানি খেয়ে যায়, তাহলে হয়তো আর কোনোদিন সে এইখানে নাও আসতে পারে। আজ একবার যখন তার এখানে রাজকুমার এসেছে, তাহলে এটাই তার জন্য সেই সুযোগ, রাজকুমার প্রতিদিন তার এখানে ঠিক বিকাল পাঁচটায় যেন একবার করে পানি খেতে আসে।

রূপকুমার ভাবল, পড়লাম তো আচ্ছা ঝামেলায়। চাইলাম পানি আর এই মেয়ে আমারে দেয় শর্ত, প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায়

পানি খেতে আসতে হবে।

ওদিকে বিলকিস ভাবল, এইটাই সুযোগ, যদি এই সুযোগে রাজকুমারকে নিজের কবজায় নেয়া যায়। যদি প্রতিদিন রূপকুমার তার এখানে পানি খেতে আসে তাহলে সে প্রতিদিন তাকে দেখতে পাবে।

ইসলাম উদ্দিন পালাকারের ভাষায় :

রূপকুমার : পানি দাও, বইন।

বিলকিস মালিনী : ভাইসাব, পানি দিতে পারি এক শর্তে।

রূপকুমার : শর্ত-টর্ত পরে, আগে পানি দাও—জীবন বাঁচাই।

বিলকিস মালিনী : না, যদি আপনে আমার শর্তে রাজি হন, তাহলেই আমি আপনাকে পানি খাওয়াব।

এদিকে রূপকুমারের তখন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। পানি না খেয়ে সে আর কতক্ষণ থাকতে পারবে?

রূপকুমার বলল : বলো, কী শর্ত তোমার?

বিলকিস সুন্দরী : ভাইসাব, প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় আপনি এই ফুলবাগানে আসবেন, আমার হাতের এক গেলাস পানি খাওয়ার জন্য।

এই জায়গায় ইসলাম উদ্দিন পালাকার নিজের হাতের ভঙ্গিটাকে কোমল করে উপরে তোলেন, আর হাতের এমন একটা ভঙ্গি দেখান যে, হাতে এক গেলাস পানি আর সেটা এগিয়ে দিচ্ছেন। মুখভঙ্গি নারীর। যেনবা তিনি বিলকিস মালিনী। এই মুদ্রাগুলো খুব খেয়াল করে তাকিয়ে দেখা দরকার। এই যে কণ্ঠস্বরে, অঙ্গভঙ্গিতে প্রতিটি মুহূর্ত ধরার চেষ্টা, কাহিনির প্রতিটি মুহূর্ত অনুযায়ী নিজেকে বদলে ফেলা—এটা ভীষণ প্রয়োজনীয় আর অসাধারণভাবে করেন ইসলাম উদ্দিন।

দর্শকের চোখ এই সময়ে উৎকণ্ঠায় বেশ টানটান। রূপকুমার শর্তে রাজি হয়েছে, কিন্তু তারপরে কী? নিশ্চয়ই বিলকিস মালিনীর সঙ্গে রূপকুমারের প্রেমটা হয়েই গেল!

হ্যাঁ, তা প্রেম এখানে হবে বৈকি। দর্শক হিসাবে আমরা চাইলে প্রেম হবে, না চাইলেও প্রেম হবে। হয়তো এখানে